আ স ম কামরুল ইসলাম

# মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

'শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি'—এরিস্টটলের এ কথাটি বোধ হয় খুব ভালোভাবেই আঁচ করেছিলেন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই ১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের কঠিন সময়ে একটি শিক্ষিত জাতির স্বপ্নের কারিগর হিসেবে তিনি একসঙ্গে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেন। তিনি জানতেন, শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় একটি দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে উপযুক্ত বিনিয়োগ। বাংলার এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে জনশক্তিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক দিন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা চোখে পড়েনি। ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে দৃষ্টিপাত করেন। মূলত তখন থেকে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হতদরিদ্র চেহারা, ভগ্নদশা কাটিয়ে উঠতে শুরু করে। ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা আবার একসঙ্গে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। ২০১৪ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা ঘোষণা করেন। এরই ধারবাহিকতায় চলতি মাসে শুরু হতে যাওয়া ৭২তম জাতিসংঘ অধিবেশনে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মূলত শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন। উল্লেখ করা দরকার, ২০১৫ সালে ১৯৩টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত SDG চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

গত তিন বছরের বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন খাতে যথেষ্ট বরাদ্দ, হাওর-চর, পাহাড়ি দুর্গম এলাকা, চা বাগান, জেলেপল্লী, বস্তিবাসী ছেলে-মেয়েসহ ভ্রাম্যমান শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সব ধরনের শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে 'একীভূত শিক্ষা সেল' গঠন, যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ করে বই উৎসব পালন, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, SLIP বরাদ্দ থেকে দরিদ্র শিশুদের জন্য পোশাক, খাতা-কলমের ব্যবস্থা, কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং পরিদর্শনব্যবস্থা, উদ্ভাবনী বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মা সমাবেশ, হোম ভিজিট করে উপস্থিতি বৃদ্ধি, মানসম্মত পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রাক-প্রাথমিক কক্ষ সুসজ্জিতসহ বিদ্যালয়ের ভবন আকর্ষণীয়করণ প্রভৃতি বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের রূপকার হিসেবে প্রমাণ দিয়েছে।

আমি মনে করি, মানসম্মত শিক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এত কার্যক্রম চলমান থাকলেও আমরা মানসম্মত শিক্ষার দোরগোড়ায় প্রবেশ করেছি মাত্র।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সদয় দৃষ্টি দিলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ আরো ত্বরান্বিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১. প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যা হলো আমাদের দেশে অন্যান্য সরকারি চাকরি না পাওয়া ব্যর্থ মানুষদের বেশির ভাগ প্রাথমিক শিক্ষকতায় যোগদান করে হতাশা নিয়ে কাজ শুরু করেন। উন্নত কিছু হলে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। সুতরাং তাঁদের পদমর্যাদা ওপরের দিকে হওয়া দরকার।

২. শিক্ষকরা মনোযোগ দিয়ে পাঠদান করবেন—এটাই তাঁর মূল কাজ। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষকদের অন্তত ৩০টি রেজিস্টার হালনাগাদ রাখা, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, প্রায় বছরজুড়ে প্রশিক্ষণ, সমাপনী পরীক্ষা প্রস্তুতি অথবা উপবৃত্তির কাজ নিয়ে শিক্ষা অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এসব কাজ কমিয়ে অথবা বিদ্যালয়প্রতি একজন অফিস সহকারী নিয়োগ দিয়ে শিক্ষকদের পাঠদানে আরো অধিক মনোযোগী করা দরকার।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর যথেষ্ট লোকবল সংকট আছে। আমার নিজ উপজেলায় (কুলাউড়া-মৌলভীবাজার) ১৭টি পদের মধ্যে মাত্র চারজন কর্মরত। এ ছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের বাইরে তাঁদের তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানসহ এত বেশি দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় যে, গড়ে দুই-তিন মাসেও সব কটি বিদ্যালয় পরিদর্শিত হয় না। পরিদর্শিত হলেও যেভাবে সময় নিয়ে নিয়মমাফিক পরিদর্শন দরকার তা হচ্ছে না। এ বিষয়টিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৪. আরেকটি হতাশাজনক চিত্র হলো প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। আমরা লক্ষ করি, তাঁদের সারা বছর তেমন কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না বললেই চলে; অথচ অর্থবছরের শেষে (এপ্রিল, মে, জুন) একসঙ্গে বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক কোনো না কোনো প্রশিক্ষণে আছেন। আমার প্রশ্ন হলো, একই সময়ে এত প্রশিক্ষণ করলে তাঁরা শ্রেণিকক্ষের কাজ কিভাবে করবেন আর প্রশিক্ষকরাই (URCI, AUEO) বা কিভাবে মনিটরিং করবেন! প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগ যদি বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ রাখত ও বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য সময় রাখত, তাহলে প্রশিক্ষণগুলো আরো ফলপ্রসূ হতো বলে আমার বিশ্বাস।

৫. আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ সরকারের সামর্থ্য সীমিত। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যা বরাদ্দ আসে, তাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর চাহিদা মেটে না। সুতরাং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ধনবান, প্রবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে।

৬. সর্বশেষ একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, তা হলো, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশন বা কিছু শিক্ষকের মানসিকতা। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক শিক্ষকই আছেন যাঁরা বিদ্যালয়ে সময়মতো যাওয়া-আসা করেন না, পাঠদানে যথাযথ মনোযোগী নন। গ্রামাঞ্চলে অনেক শিক্ষক রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিচার-সালিসে জড়িত, যা শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। সুতরাং সম্মানিত শিক্ষকদের আরো বেশি আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানাই।

পরিশেষে বলতে চাই, জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে অপরিহার্য স্তম্ভ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। একটা ভালো বীজ থেকে যেমন একটা গাছ মহীরুহ হয়ে ওঠে, তেমনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ গঠন ও উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাই চলমান মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার বীজ। সুতরাং আসুন শিক্ষিত জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত শক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সবাই যে যার জায়গা থেকে নিঃস্বার্থ সেবাদান করে ইতিহাসের অংশ হই।

**লেখক :** চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও সভাপতি
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি, কুলাউড়া
মৌলভীবাজার

গত তিন বছরের বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন খাতে যথেষ্ট বরাদ্দ, হাওর-চর, পাহাড়ি দুর্গম এলাকা, চা বাগান, জেলেপল্লী, বস্তিবাসী ছেলে-মেয়েসহ ভাসমান শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সব ধরনের শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে 'একীভূত শিক্ষা সেল' গঠন, যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ করে বই উৎসব পালন, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রভৃতি বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের রূপকার হিসেবে প্রমাণ দিয়েছে